ন জ রু ল - জী ব নে
প্রেমের এক অধ্যায়

কাজী মোতাহার হোসেন এবং
মিস্ ফজিলতুন্নেছাকে লিখিত
অ প্র কা শি ত প ত্রা ব লী

সৈয়দ আলী আশরাফ
সম্পাদিত

ঐতিহ্য

নজরুল-জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়
সম্পাদনা : সৈয়দ আলী আশরাফ

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

ঐতিহ্য প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
মে ২০২৪

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬৭
বাংলা বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

NAZRUL-JIBONE PREMER EK ODDHAY
Edited by Syed Ali Ashraf
Published by Oitijjhya
Date of Publication : May 2024

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2024 ==
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

ISBN 978-984-776-405-4

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের হস্তে
এই গ্রন্থ সমর্পিত হল

সূচি

ভূমিকা ০৯
নজরুল জীবনের এক অধ্যায় ১১
এই পত্রাবলী এবং প্রেমের কবিতা ২৫
পত্রাবলী ৩৯
পরিশিষ্ট ৮৫

ভূমিকা

এ বইতে নজরুল ইসলামের আটটি অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশিত হল। কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ আমি 'দিলরুবা' পত্রিকার নজরুল-সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলাম ('দিলরুবা', এপ্রিল, ১৯৪৯)। আবদুল কাদির সাহেব সেই অংশবিশেষগুলি তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনা-সম্ভার' বইতে ছাপিয়েছেন। এই বইতে সম্পূর্ণ চিঠি ছাপিয়েছি।

এই চিঠি আটটির মধ্যে সাতটি কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবকে লিখিত, একটি মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে।

এই চিঠিগুলো ছাড়া আরো কয়েকটি চিঠি কাজী সাহেবের বাড়ীর খোলা শেলফে ছিল। সেগুলো কে বা কারা কখন নিয়েছেন তা জানি না। এগুলোও গুম, হয়ে যাবে ভেবে আমি চিঠিগুলো উদ্ধার করি এবং রক্ষা করি। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ ফাইনাল বর্ষের ছাত্র। এ উদ্ধারকার্য সম্ভব হত না যদি কাজী সাহেব রাজী না হতেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মিসেস যোবায়দা মির্জা এবং তাঁর বান্ধবী যিনি বর্তমানে আমার সহধর্মিণী আমাকে এ চিঠিগুলোর খবর না দিতেন এবং আমার হাতে চিঠিগুলো সমর্পণ না করতেন।

যদিও নিরুদিষ্ট চিঠিগুলো পেলে নজরুলের মনোভাবের গতি আরো বোঝা যেত, এই কয়টি চিঠিই তাঁর জীবনের এক অলিখিত অধ্যায় প্রকাশ করে বলে এগুলো একত্রে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেছি। নজরুল যে মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন, এবং তাঁকে লক্ষ্য করে অনেকগুলো প্রেমের কবিতা রচনা করেছিলেন, এ চিঠিগুলো তাই-ই প্রমাণ করে।

পরিশিষ্টে অপ্রকাশিত আরো দুটি চিঠি ছাপিয়েছি। প্রথম চিঠিটির জন্য আমি ন্যাশনাল ব্যাংকের মানেজিং ডিরেক্টর মমতাজ হাসান সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয় চিঠিটি পেয়েছি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ম্যানেজার রিয়াজুল ইসলাম সাহেবের সৌজন্যে। সে জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নজরুলের ঢাকা-জীবন সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনার কাজে এবং এই পত্রাবলীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের কবিতা এবং গানের নিগূঢ় সম্বন্ধ আলোচনা করার কাজে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের কাছ থেকে। 'সওগাত' সম্পাদক নাসিরুদ্দিন সাহেবও মিস্ ফজিলতুন্নেছা এবং নজরুল-জীবনের অংশবিশেষ সম্বন্ধে আলোচনা করে আমাকে বিশেষভাবে ঋণী করেছেন। বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরী, ঢাকা রেডিও অফিস এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা সংগ্রহ আমাকে উপকৃত করেছে।

এই পুস্তক প্রকাশনার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ম্যানেজার রিয়াজুল ইসলাম সাহেব। অঙ্গসজ্জা তাঁরই দান। অঙ্গসজ্জা এবং প্রচ্ছদ পরিকল্পনার কাজে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশনের সহকারী কর্মাধ্যক্ষ বন্ধু লতিফুল্লাহর সহায়তাও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করছি।

সৈয়দ আলী আশরাফ
আগস্ট ১৯৬৭
করাচী

নজরুল জীবনের
এক অধ্যায়

১

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ।

ফেব্রুয়ারী মাসে মুসলিম সাহিত্যসমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন বসল ঢাকায়। কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং গায়ক হিসেবে সাদরে আহূত হয়ে নজরুল ইসলাম ঢাকায় এলেন। গাইলেন স্বরচিত 'খোশ-আমদেদ'ঃ

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী।
তালি-বন ঝুমরি বাজায়, গায় "মোবারক-বাদ" কোয়েলা।
শবেবরাত আজ উজালা গো, আঙিনায় জ্বল্‌ল দীপালী।।
ও-চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি।।
দখিণের হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতী।।
উলসি' উপচে প'ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি।।[১]

ষোল চরণের সম্পূর্ণ গানটি পদ্মার বুকে ষ্টীমারে বসে লেখা ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিকী পত্রিকা 'শিখা'য় সম্পূর্ণ গানটি মুদ্রিত হয়। নজরুল ঢাকায় মাত্র দুদিন থেকেই কৃষ্ণনগর চলে যান। এই সভায় তিনি আরও একটি গান পরিবেশন করেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ১৯২৮ সালে দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করল। প্রথম বৎসর সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী আবুল হোসেন। দ্বিতীয় বৎসর সম্পাদক হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার কাজী মোতাহার হোসেন। কবি অধিবেশনের উদ্বোধন করেন "চল্‌ চল্‌, চল্‌, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল" এই গানটি গেয়ে।

এই সমাজের পত্তন হয় ১৯২৬ সালে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ মুসলিম শিক্ষক এবং ছাত্র মিলে এ সমাজ স্থাপিত করেন। প্রথম সম্পাদক কাজী আবুল হোসেনের ভাষায় :

"শ্রীমান আবদুল কাদের প্রমুখ আমাদের কতিপয় নবীন সাহিত্যপ্রাণ বন্ধু মিলে গত বৎসর ১৯শে জানুয়ারী শ্রদ্ধাস্পদ মৌঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের পৌরহিত্যে এই সাহিত্যসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার ২১ দিন পরে এই শিশু, সমাজের জাতক্রিয়ার পৌরহিত্য করেছিলেন একজন কুলীন ব্রাহ্মণ– আমাদের চুল পাকা, নবীন গল্পনিপুণ শ্রদ্ধেয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।"[২]

"এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তা চর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন, পুরাতন সর্ব-প্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন।"[৩] এই সংযোগ সাধন করার উদ্দেশ্যে এবং জীবনকে 'সরস, সুন্দর ও বৈচিত্র্যবিপুল' করে তোলার উদ্দেশ্যে এই সমাজ চাইলেন 'সহিষ্ণু, চিন্তাশীল গুটিকতক লোক' যাঁরা 'সমাজের নিস্পন্দ জীবনের উপর আঘাত' করবেন, যাঁরা নিজেদের 'চিন্তাধারা কেন্দ্রীভূত' করবেন এবং প্রকাশ করবেন 'বিপুল জনসঙ্ঘের ভাষায়। তবেই সমাজের কর্ণে তা পৌঁছবে।"[৪]

এই সমাজের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কাজী আবুল ফজল, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, মৌলভী আবদুর রশীদ বি, এ, বি-টি (কলেজিয়েট স্কুল) এবং আবদুল কাদির। যদিও তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলেছেন যে 'মুসলমান সাহিত্য' রচনা করা হবে এ সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য, এ সমাজের প্রধান সাহিত্যিকদের আদর্শ ছিল কিছুটা ভিন্নজাতীয়। সভাপতি বলেছিলেন: "কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদিস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবন থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়েই হিন্দু মুসলমানের চেনা পরিচয় হবে। চেনা হলেই ভাব হবে।"[৫]

সভাপতির উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক, এই সমাজের কর্ণধারদের লেখা থেকে মনে হয় সমাজকে সচেতন করতে যেয়ে এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গাথা গাইতে যেয়ে তাঁরা সমাজের ঐতিহ্যকে পালটে দিতেই উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। সংস্কারের বদলে বর্জনের আকাঙ্ক্ষাই যেন প্রবল হয়ে উঠেছিল। মমতাজুদ্দীন আহমদ মাদ্রাসা শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে লিখলেন : "দিন দিন জ্ঞানের উন্নতিতে নূতন নূতন জ্ঞানরূপ অস্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে।...কিন্তু মাদ্রাসায় এই নূতন জ্ঞান দেয় না। অতএব

মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষার theoretical এবং practical দুই দিকেই অসম্পূর্ণ, ক্ষতিজনক অতএব সর্বতোভাবে পরিহার্য।"[৬] শিক্ষা-সমস্যা আলোচনা করতে যেয়ে কাজী আবুল হোসেনও মাদ্রাসা-শিক্ষাই মূর্খতা-বৃদ্ধির কারণ বলে প্রচার করলেন। তবে তিনি ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে আরবী শিক্ষার সমন্বয় বিধান করা প্রয়োজন বিবেচনা করেছিলেন।[৭] হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কামনায় এদের মধ্যে কেউ কেউ আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ 'বাঙলার জাগরণ' সম্পর্কে বলতে যেয়ে রামমোহন, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথকে নেতা হিসেবে মেনেছেন। বাঙলার জাগরণ বলতে তিনি আসলে হিন্দুদের জাগরণের কথাই বলেছেন। হিন্দুরা তাঁর মতে এখনও স্বাপ্নিক, মুসলমানেরা বস্তুতান্ত্রিক। উভয়ের কারণ সম্বন্ধে তিনি নীরব।[৮] এই সমাজের তাই সত্যিকার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী হিসেবে হিন্দু মুসলিমের এক জাতীয়তার বাণী প্রচার করা, প্রাচীন ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে মুসলমানদের 'মুক্ত' করে তাদের মধ্যে আধুনিক সমাজ এবং জ্ঞানচেতনা জাগ্রত করা, তাদের দৃষ্টি ধর্মবোধ-দ্বারা অনুপ্রাণিত সমাজ থেকে সরিয়ে এনে আধুনিক সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে নিবদ্ধ করা।

নজরুলের পক্ষে এ সমাজের সঙ্গে মিলে যেতে তেমন দ্বিধা হওয়ার কথা নয়। তিনি হিন্দু রমণীকে বিবাহ করেছিলেন, কালীসংগীত রচনা করেছিলেন, কীর্তন লিখেছিলেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গান রচনা করেছিলেন। অন্যদিকে মুসলিম জাগরণ তিনি কামনা করতেন। 'আনোয়ার পাশা', 'কামাল পাশা', 'জগলুল পাশা' তাঁর আদর্শ ছিল। ঠিক এই সময়ই প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর চিঠির এবং অভিযোগের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা আমাদের প্রণিধানযোগ্যঃ "বাংলা-সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাঙলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরাজী সাহিত্য হতে গ্রীক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাঙলা-সাহিত্য হিন্দু মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে নিত্য-প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী; তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু, আমি জেনে শুনেই তা করেছি।"[৯]

নজরুলের যে কয়টি চিঠি এখানে ছাপিয়েছি তাতেও দেখি তিনি জন্মান্তরবাদকে অন্তরের সঙ্গে মানেন।[১০] তিনি হয়ত গভীরভাবে চিন্তা করে মতবাদ গ্রহণ বা বর্জন করতেন না, কিন্তু তাঁর অনুভূতির উপর হিন্দু, এবং মুসলমান উভয়ের ধর্মের প্রভাব ছিল। উভয় সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন যেন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই জন্যই তাঁর সম্প্রীতি ছিল। দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে এসে এই সম্প্রীতি আরো গাঢ় হল।

কাজী মোতাহার হোসেনের বিশেষ অনুরোধে তিনি দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেন। এবারও কবি, সংগীতজ্ঞ এবং গায়ক হিসেবে। এবার তিনি প্রায় আড়াই মাস ঢাকায় ছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেন তখন বর্ধমান হাউজে থাকতেন। নজরুল এবং কাজী সাহেব এক ঘরেই শুতেন। এই জন্যই নজরুল বলছেন যে কাজী সাহেবের স্ত্রী বোধ হয় তাকে 'সতীন' বলেই মনে করেন। দুজনের সখ্যতা এই সময়েই গভীরতা অর্জন করে।[১১]

বুদ্ধদেব বসু, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও নজরুল এই সময়েই পরিচিত হন। বুদ্ধদেব বসুর বাড়ীতে, অর্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক রসিক জ্যোতির্ময় রায়ের বাড়ীতে আর অধিকাংশ সময় প্রতিভা 'ওরফে রানু সোমের বাড়ীতে আড্ডা বসত। নজরুল রানু সোমকে গান শেখাতেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে দিলীপ রায়কে তিনি পরাস্ত করবেন। দিলীপ রায় রানু সেনকে গান শিখিয়ে তাঁর গান রেকর্ড করিয়েছিলেন। তাঁর ভারিক্কি গলায় 'পাগলা মনটারে তোর বাঁধ' এত সুন্দরভাবে উৎরে গিয়েছিল যে নজরুলের জিদ্ হ'ল রানু সোমকে দিয়ে তার চেয়েও ভাল গান গাওয়াবেন।

অনেক সময় বেশ রাত হয়ে যেত রানু সোমের বাড়ী থেকে ফিরতে। ফলে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়। একদিন কয়েক জন হিন্দু যুবক নজরুলকে লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে। নজরুল একজনের লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুতবেগে লাঠি চালিয়ে আত্মরক্ষা করেন, কয়েকজনকে আহত করেন এবং শত্রুব্যূহ থেকে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসেন। কাজী মোতাহার হোসেন বহুদিন সযত্নে এ লাঠি রক্ষা করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন। উত্তরকালে এই প্রতিভা সোমের বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং প্রতিভা বসু নামে তিনি গল্প-লিখিয়ে হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

এই সময়েই নজরুল 'কে বিদেশী মন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে' গজলটি রচনা করেন। রানু সোমের বাবার বাড়ী বনগাঁতে ছিল বলে এবং নজরুলের সঙ্গে রানু সোমের দেখাসাক্ষাৎকে বিকৃত করে রটনা করার উদ্দেশ্যে 'শনিবারের চিঠি' এই গানকে বিকৃত করে :

কে বিদেশী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে
বাঁশী-সোহাগে ভিরমী লাগে, বর ভুলে যায় বিয়ের কনে।
ঘুমিয়ে হাসে দুষ্টু খোকা বেরিয়ে আসে দাঁতের পোকা
(বোকা-চাঁদের লাগল ধোঁকা খোকা-কবির বাঁশীর সনে।)
খোকা-চাঁদের লাগল ধোঁকা শ্যাওলা-পড়া নীল গগণে।

বুদ্ধদেব বসু, এবং অজিত দত্ত তখন 'প্রগতি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তারাও ছিলেন নজরুলের ভক্ত। তাঁর গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, ঝাঁকড়া চুল, গৈরিক লেবাস, চরম আত্মভোলা মনের অনাবিল উচ্ছ্বাস এবং গান আর কাব্যের আড্ডায় আত্মদানের প্রভাবে সবাই মুগ্ধ হত। বুদ্ধদেব বসু এই সময়কার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর মাতিয়ে তুলেছেন। 'কল্লোলে' গজল-গানের প্রথম পর্যায় বেরিয়ে গেছে– তারপর বয়ে চলেছে গানের অফুরন্ত স্রোত– যেন তা কখনও ক্লান্ত হবে না, ক্ষান্ত হবে না।...

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে একটি মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের প্রগতির আড্ডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই চলেছি আমরা। কেউ কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধরে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, বড়ো বড়ো লালা-ছিটে লাগা মদির তার চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা-লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের স্ফূর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবী এবং তার উপর কমলা কিংবা হলদে রঙের চাদর– দুটোই খন্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট করে চোখে পড়ে, তাই।' বলে ভাঙা ভাঙা গলায় হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হারমোনিয়াম, চা, পান, গান, গল্প, হাসি। কখন আড্ডা ভাঙ্গল মনে নেই– নজরুল যে ঘরে ঢুকতেন সে-ঘরে ঘড়ির দিকে কেউ তাকাত না। আমাদের প্রগতির আড্ডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতিবারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। এমন উদাস প্রাণশক্তি কোনো মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি।[১২]

নজরুল শুধু রানু সোমদের বাড়ীতেই নয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রের বাড়ীতেও যেতেন এবং তাঁর মেয়ে উমা মৈত্রকে স্বরচিত গান শেখাতেন। উমা ওরফে নোটন মৈত্র আই-এস-সির ছাত্রী